কার্প-গলদা মিশ্রচাষঃ

বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে স্বাদু পানির দ্রুত বর্ধনশীল চিংড়ির মধ্যে গলদা চিংড়ি অতি পরিচিত। প্রাকৃতিক পরিবেশে গলদা চিংড়ি স্বাদু পানি এবং ঈষৎ লবণাক্ত পানিতে পাওয়া যায়। তবে নদীর উঁচু অংশে যেখানে জোয়ার-ভাটার তারতম্য বেশি সেখানে এরা অবস্থান করতে বেশি পছন্দ করে। গলদা চিংড়ি প্রাকৃতিক পরিবেশে বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, কম্বুডিয়া, ভিয়েতনাম, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়। স্বাদু পানির চিংড়িকে প্রন (Prawn) বলে। গলদা চিংড়ি বিশ্বে "Giant Fresh water Prawn" নামে পরিচিত। গলদা চিংড়ি অমেরুদন্ডী, শীতলরক্ত বিশিষ্ট, খোলসে আবৃত নিশাচর সর্বভূক প্রাণী। খোলস পরিবর্তনের মাধ্যমে দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে। পচনশীল জৈব পদার্থ, প্রাণী, উদ্ভিদকণা (Diatom, Copepod, Crustacea) প্রভৃতি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। লার্ভা বা রেনু অবস্থায় এরা প্লাংক্টন ভোজী এবং বাচ্চা বা কিশোর ((Juvenile) অবস্থায় পানির তলদেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীজ খাদ্য গ্রহণ করে। পুরুষ গলদা, স্ত্রী গলদার চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড় হয় এবং দ্রুত বর্ধনশীল। এরা স্বজাতি ভোজী। খোলস পরিবর্তনের সময় নরম চিংড়িকে সুযোগ পেলে খেয়ে ফেলে।

গলদা চিংড়ি চাষের সুবিধা :

- গলদা চিংড়ি দ্রুত বর্ধনশীল।
- সুস্বাদু, কাটা বিহীন, সহজে রান্না করা যায়।
- স্বাদু পানিতে এবং অল্প লবণাক্ত পানিতে (লবণাক্ততা ৫ পিপিটির কম) চাষ করা যায়।
- বাংলাদেশের সর্বত্র চাষের সুযোগ রয়েছে।
- একক ও মিশ্রচাষ (কার্প জাতীয় মাছ-রুই, কাতলা, মৃগেল এর সাথে) করা যায়।
- প্রাকৃতিক উৎস ও হ্যাচারীতে উৎপাদিত রেনু পোনা বা পিএল পাওয়া যায়।
- সর্বভূক প্রাণী, খাদ্য হিসাবে সহজে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা যায়।
- সম্পূরক খাদ্য তৈরীর উপাদান সহজে সংগ্রহ করা যায়।
- বাজার মূল্য, চাহিদা বেশি এবং সহজে বিক্রয় করা যায়।
- রোগ বালাই কম এবং চিকিৎসা করা যায়।

গলদা চিংড়ির চাষ পদ্ধতি :

আমাদের দেশে গলদা চিংড়ি সাধারণতঃ ২টি পদ্ধতিতে চাষীরা চাষ করে থাকেন।

১. একক চাষ পদ্ধতি : শুধুমাত্র গলদা চিংড়ির চাষ একক চাষ । একক চাষ পদ্ধতিতে প্রতি একরে ৬০০০-১০০০০টি গলদা রেনু পোনা মজুদ করা হয়। উৎপাদন প্রতি একরে ৪০০-৫০০ কেজি হয়ে থাকে।

২. মিশ্র চাষ পদ্ধতি : গলদা চিংড়ির সাথে রুই, কাতলা, মৃগেল জাতীয় মাছের চাষ করা হয়। মিশ্র চাষ পদ্ধতিতে প্রতি একরে ২০০০টি-৪০০০টি গলদা চিংড়ি রেনু এবং ২০০০-৫০০০টি কার্প জাতীয় মাছের পোনা মজুদ করা হয়। উৎপাদন প্রতি একরে চিংড়ি ২০০-৩০০ কেজি এবং কার্প জাতীয় মাছ ২০০০-২৫০০ কেজি হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে আধুনিক পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ির চাষে উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আধুনিক পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ির উৎপাদন প্রতি একরে ১২০০ থেকে ২৫০০ কেজি হয়েছে। আমাদের দেশে গলদা চিংড়ির আধুনিক চাষ গুটি কয়েক জন চাষী ছাড়া ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি। আধুনিক চাষের জন্য চাষ পুকুরের সাথে একটি নার্সারী পুকুর থাকা অত্যাবশ্যক।

নার্সারী পুকুরের আয়তন চাষ পুকুরের ২০ শতাংশ হওয়া ভাল। চাষ পুকুর এক একর ১০০ শতাংশ হওয়া ভাল। চাষ পুকুর এক একর ১০০ শতক হলে নার্সারী পুকুরের আয়তন হবে ২০ শতক। নার্সারী পুকুরটির পাড় শক্ত, মজবুত, দৃঢ়ভাবে মেরামত করতে হবে। পুকুরটির পানির গভীরতা থাকতে হবে ৪-৫ ফুট এবং তলা সমতর হতে হবে। পুকুরটির পাড়ের উপরের অংশ নেট দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। নেট দিয়ে ঘিরে দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাইরে থেকে সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়া, কুঁচে, নার্সারী পুকুরের ভিতরে প্রবেশ করে রেনু পোনা খেতে না পারে। এছাড়া পুকুরের উপর দিয়ে রশি বা ফিতা ঘন ঘন করে টেনে দেওয়া হয় যেন পাখী পুকুরে নামতে না পারে। এর ফলে রেনু পোনার বাঁচার হার বৃদ্ধি পায় এবং রোগ জীবানুর আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে জীব নিরাপত্তা বা জৈব নিরাপত্তা বা বায়ো সিকিউরিটি (Bio-security) বলে।

গলদা চিংড়ির রেনু পোনা প্রাপ্তি :

আমাদের দেশে প্রাকৃতিক উৎস- নদী এবং সাগরের মোহনা থেকে গলদার রেনু পাওয়া যায়। এছাড়া হ্যাচারীতে উৎপাদিত গলদার রেনযু পাওয়া যায়। বৎসরের শুরুতে চৈত্র-বৈশাখ মাসে (মার্চ-এপ্রিল) মাসে প্রথম রেনু পাওয়া যায়। বৎসরের শেষ দিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) পর্যন্ত গলদা রেনু পাওয়া যায়।

রেনু পোনা মজুদ :

প্রথম বার, বৎসরের শুরুতে রেনু পোনা সংগ্রহ করে নার্সারী পুকুরে মজুদ করা হয়। প্রতি শতকে ১০০০টি পোনা নার্সারীতে মজুদ করা যায়। নার্সারীতে রেনু পোনা ৬০-৭৫ দিন লালনের পর কিশোর গলদা চিংড়ির স্ত্রী, পুরুষ বাছাই করা যায়। চাষ পুকুরে শুধু পুরুষ কিশোর চিংড়ি মজুদ করা হয়, কারণ পুরুষ চিংড়ির বৃদ্ধি বেশি এবং দ্রুত হয়। কিশোর স্ত্রী চিংড়ির পৃথকভাবে একক চাষ করলে উৎপাদন মোটামুটি ভাল পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে চাষীর আরও পুকুর প্রয়োজন হয়। নতুবা চাষী করে দিতে পারেন কেজি অথবা পিচ হিসাবে। নার্সারী পুকুর হতে প্রথমবার কিশোর চিংড়ি আহরণ করে (চাষ পুকুরে মজুদের পর), পূণরায় নার্সারী পুকুরটি প্রস্তুত করতে হবে। অতঃপর পূণরায় (দ্বিতীয়বার) রেনু পোনা মজুদ করতে হবে। এক একর বা ১০০ শতক চাষ পুকুরে কিশোর পুরুষ চিংড়ি মজুদের জন্য নার্সারীতে ২০,০০০টি রেনু পোনা মজুদ করা হয়। নার্সারী পুকুরে রেনু পোনা বাঁচার হার শতকরা ৮০%। মজুদকৃত রেনু পোনার শতকরা ৪০ % পুরুষ গলদা চিংড়ি পাওয়া যায়। নার্সারী পুকুরে ২০,০০০টি রেনু পোনা মজুদ করলে বাঁচার হার ৮০% হিসাবে ১৬,০০০টি কিশোর চিংড়ি পাওয়া যাবে, সেখান হতে ৬৪০০টি পুরুষ চিংড়ি পাওয়া যাবে। চাষ পুকুরে এক একর (১০০ শতকে) ৫০০০টি পুরুষ কিশোর চিংড়ি মজুদ করা হয়।

চাষ পুকুরে পুরুষ কিশোর গলদা চিংড়ি মজুদ :

জুন-জুলাই মাসে ২০-২৫ গ্রাম ওজনের ৫০০০টি পুরুষ কিশোর চিংড়ি মজুদ করা হয়। নভেম্বর মাস হতে আংশিক আহরণ শুরু হয় এবং ডিসেম্বর মাসে আহরণ শেষ করা হয়। জানুয়ারী মাসে চাষ পুকুর সেচ দিয়ে প্রস্তুত করা হয় এবং ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে পূণরায় নার্সারী হতে (দ্বিতীয় বার মজুদ রেনুপোনা) পুরুষ কিশোর চিংড়ি ৩০-৩৫ গ্রাম ওজনের আহরণ করে মজুদ করা হয়, ৫০০০টি। পূণরায় জুন মাসে চিংড়ি আহরণ করা হয়। চাষ পুকুরে মজুদ কিশোর চিংড়ির বাঁচার হার শতকরা ৯০-৯৫% হয়ে থাকে। কোন চিংড়ির বৃদ্ধি কম হলে পরবর্তী সময়ে আহরণের জন্য রেখে দেওয়া হয়।
এই পদ্ধতিতে বৎসরে দুইবার চাষের ফলে প্রতি একরে ১০০০ থেকে ১২০০ কেজি চিংড়ি উৎপাদন করা যায়।

চাষ পুকুর ও নার্সারীতে সিলভার কার্প পোনা মজুদ :

পানির গুণাবলীর সাম্যবস্থা বজায় ও প্লাংক্টন সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য প্রতি একরে ৭০০-১০০০টি বড় আকৃতির (১৫০-২০০ গ্রাম ওজনের) সিলভার কার্প-এর পোনা মজুদ করা যায়। বৎসর শেষে প্রতিটি মাছের ওজন ১.০ কেজি- ১.৫ কেজি হয়ে থাকে। প্রতি একরে ৬০০-৭৫০ কেজি মাছ উৎপাদন করা যায়।

নার্সারী ও চাষ পুকুর প্রস্তুত :

নার্সারী ও চাষ পুকুর নিয়ম মোতাবেক সেচ দিয়ে শুকিয়ে তলার পঁচা কাঁদামাটি তুলে ফেলে প্রয়োজন মতো মাটিতে চুন, সার প্রয়োগ করা হয়। অতঃপর ঘন ফাঁসের নেট দিয়ে পানি ছেকে প্রবেশ করানো হয়। পানির গভীরতা নার্সারী পুকুরে পানির গভীরতা ১.২৯৫ মিটার এবং চাষ পুকুরে পানির গভীরতা ১.৫-১.৮ মিটার থাকা ভাল। গলদা চিংড়ি স্বজাতিভোজী। খোলস পরিবর্তনের সময় নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য গাছের ডাল, বাঁশের কঞ্চি, পিভিসি পাইপ, বিভিন্ন ধরণের উপকরণ ব্যবহার করা হয়। পুরুষ গলদা চিংড়ির পা আকারে বড় হয় এবং অন্য চিংড়িকে সাড়াশি বা চিমটা দ্বারা আক্রমন করে ক্ষতিগ্রস্থ করে। প্রতি পনের দিন পর চিংড়ির পুকুরে বা ঘেরে জাল টেনে পা ভেঙ্গে দিতে হয়। পা ভেঙ্গে দেওয়ার ফলে অন্য চিংড়ি আক্রান্ত বা খাওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং চিংড়ির বৃদ্ধি বেশি হয়। পা নাড়ানোর জন্য দেহের ১৫-২০% শক্তি ব্যয় হয়।

গলদা চিংড়ির রোগ বালাই :

গলদা চিংড়ির পুকুরের পরিবেশ ঠিক থাকলে কোন রোগ বালাই হয় না। পরিবেশ নষ্ট হলে বিষাক্ত গ্যাসের কারণে চিংড়ি মারা যায়। এছাড়া এন্টেনা কাটা/ভাঙ্গা, লেজ পচা, গায়ে শেওলা হওয়া, মাতায় পানি জমা, মাথায় ক্রিমি হওয়া রোগ দেখা যায়। এসব রোগের সঠিক চিকিৎসা করা হলে চিংড়ি সুস্থ হয়ে যায়।

গলদা চিংড়ির উৎপাদন:

বর্তমানে গলদা চিংড়ির উৎপাদন বৎসরে ২০০-৩০০ কেজি প্রতি একরে। গলদা চিংড়ি এবং মাছ উৎপাদন করে চাষীরা প্রতি একরে ২,০০,০০০-২,৫০,০০০ টাকা লাভ করে থাকেন। আধুনিক পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি চাষে প্রতি একরে ১০০০-১২০০ কেজি চিংড়ি এবং উপজাত হিসাবে ৭৫০-১০০০ কেজি মাছ উৎপাদন করা যায়। প্রতি কেজি গলদা চিংড়ি উৎপাদনে ব্যয় হয়ে থাকে ৩৮০-৪০০ টাকা। আধুনিক পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি চাষ করে সহজে প্রতি একরে ৪,৫০,০০০-৫,০০,০০০ টাকা লাভ করা যায়। বাংলাদেশের সর্বত্র গলদা চিংড়ি চাষের সুযোগ রয়েছে।